ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

(বাংলা-bengali-البنغالية)

আবু শুআইব মুহাম্মাদ সিদ্দীক

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿المرأة بين الإسلام والحضارة الغربية﴾

(باللغة البنغالية)

أبو شعيب محمد صديق

2009 - 1430

islamhouse.com

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর পূর্বে আমেরিকার নারী সমাজে একটি নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, যা 'দ্বিতীয় নারী আন্দোলন' (WOMEN'S MOVEMENT 11) বলে খ্যাত। জুলাই ১৯৮৯-এ উক্ত WOMEN'S MOVEMENT 11 এর ওপর একটি পরিচিতি ছাপা হয় আমেরিকান মাসিক ম্যাগাজিন (SPAN) - এ।

এ-দ্বিতীয় নারী আন্দোলন, প্রথম নারী আন্দোলনটি যে অপ্রাকৃতিক এবং ভুল ছিল তারই স্বীকারোক্তির নামান্তর। জনৈক সমালোচকের ভাষায় এটি হল পুরনো আন্দোলনের গায়ে একটি নীরব পরিবর্তন। (QUIET SHIFT) এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমান আমেরিকার নারীসমাজ ভীষণ দুরাবস্থার জীবনযাপন করছে। চাকরিজীবী নারীরা বছরে ১৩০০০ ডলারেরও কম বেতন পেয়ে থাকে যা আমেরিকায় সাধারণ জীবনযাপনের জন্য অপর্যাপ্ত। গর্ভধারণ, বাচ্চাদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা ইত্যাদি আমেরিকার নারীসমাজকে এক ভয়াল দুর্বিপাকে ফেলে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, ২৫ থেকে ৪৫ বছরের মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭০ভাগ বিভিন্ন অফিস ও কলকারখানায় কর্মরত। কিন্তু বেতনের দিক থেকে পুরুষের তুলনায় কম বেতন পেয়ে থাকে, বড় কোনো পদে উন্নীত হওয়া তাদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

প্রথম নারী আন্দোলনের পথিকৃতদের সমস্ত জোর এ-কথার উপর ছিল যে নারী-পুরুষ সবদিক থেকে সমান অধিকার ভোগ করবে। নারী, পুরুষ থেকে কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকবে না, বরং মানুষ হিসেবে পুরুষের মতোই অভিন্ন স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবে। আর নারী যখন তার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার পেয়ে যাবে পুরুষের মতোই তাদের নিজস্ব ভুবন নির্মাণ করতে সক্ষম হবে নিশ্চিতরূপেই, সক্ষম হবে তাদের জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে।

পাশ্চাত্যের নারীরা   তাদের কাঙ্খিত পূর্ণ স্বাধীনতা কোলে উঠিয়ে নিতে সক্ষম হল। ভোগ করার সুযোগ পেল পুরুষদের সাথে সমান অধিকার। পুরুষ নারীর অভিভাবক, এ ধারণা প্রচণ্ড ঘৃণায় নিক্ষিপ্ত হল ইতিহাসের বিবর্ণ আর্কাইভে। স্বাধীন হল নারী, অধিকার পেল পূর্ণমাত্রায়। তবে সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। পুরুষ তার স্বাধীনতা-অধিকার ভোগ করতে পারে নিজের মতো করে। পুরুষ তার ভিত্তিমূলে একাই দাঁড়াতে পারে শক্তপদে। তবে নারীরা তা পারে না। প্রতীয়মান হল যে নারী সম্প্রদায়ের সমান অধিকারের সাথে সাথে দরকার রয়েছে প্রয়েজনীয় প্রতিরক্ষার (PROTECTION); কেননা নারী তার নিজ ভিত্তিমূলে একাকি দাঁড়াতে পারে না। তবে প্রশ্ন হল ঘরোয়া জীবনে পুরুষের সুরক্ষা-প্রতিরক্ষার বলয় ডিঙ্গিয়েই তো স্বাধীন হয়েছে নারী, কেননা এধরনের পুরুষনির্ভরশীলতাকে তারা অসম্মানজনক আচরণ বলে ভেবেছিল। এবার যখন স্বাধীনতাভোগের ক্ষেত্রে আলাদা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, নারীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হলেও পুরুষের অভিভাকত্ব স্বীকার করে নিতে শুধু রাজি নয়, বরং বাধ্য পর্যন্ত হল। নারী   আন্দোলনের এক নেত্রী TAR WHELAM রাষ্ট্রকে, তাই, দায়িত্ব দিলেন নারী সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষক হিসেবে কাজ করে যেতে। (দ্রঃ SPAN পৃঃ ৩৭)। নারী সমাজ তাদের ঘরোয়া পুরুষ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান অস্বীকার করে পরিশেষে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব মেনে নিতে বাধ্য হল।

এ-ধরণের ঘটনাবালি স্পষ্টই প্রমাণ করছে যে আজকের উন্নত বিশ্বের নারী সম্প্রদায়ের অরোধ্য মিছিল পরিশেষে ইসলামের শাশ্বত আদর্শের দিকেই ধাবিত হচ্ছে স্বাভাবিক গতিতেই। মানুষ পরিচালিত

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা খোদ মানুষকেই মানতে বাধ্য করছে যে আল্লাহ-নির্দেশিত বিধানই মানব জীবনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বিধান।

অভিজ্ঞতার পর

LINDA BURTON জনৈক আমেরিকান রমণী, তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম 'WHAT'S SMART WOMEN LIKE YOU DOING AT HOME?' আপনার মত একজন স্মার্ট নারী বাড়িতে বসে কি করছে?' উক্ত ভদ্র মহিলার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তার ভাষায় এই যে 'আমার ঘরে থাকার ইচ্ছা কখনোই ছিল না, আমি রীতিমত এক কোম্পানির চাকুরে ছিলাম। ৩৩ বছর বয়সে আমার ঘরে একটি ছেলেসন্তান জন্ম নেয়। ওকে সামলাতে গিয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। কিছুদিন যেতে না যেতেই আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয়বার চাকরিতে ফিরে যাই। এ-অবস্থায় বিকেল এবং সপ্তাহান্তের ছুটির দিনের সময়টুকু কেবল বাচ্চাকে দিতে সক্ষম হই। এ-সামন্য সময়টুকু বাচ্চার জন্য কখনোই যথেষ্ট ছিল না। তাই একটা নার্সারি খুঁজে বের করে ওকে সেখানে রেখে আসি। নার্সারিটি অসম্পূর্ণ ভেবে একমাস পরেই বাচ্চাকে বাসায় নিয়ে আসি। দ্বিতীয়বারের মতো চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে বাচ্চা সামলাতে আরম্ভ করি। দু'বছর সময় একটি উৎকৃষ্ট নার্সারির তালাশেই কেটে যায়, তিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়ে বসি।

আবারও একটা চাকরিতে ফিরে যাই। বাচ্চা দুটোকে একটা ঘরোয়া ধরনের নার্সারিতে রেখে অফিস করতে যাই। কিন্তু সেখানেও আমার কাঙ্খিত শিশুসেবা খোঁজে না পেয়ে হতাশ হই। পরিশেষে বাসায় বসে করার-মতো একটি চাকরি খোঁজে নেই। আমি বাচ্চাদের নিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হই তা আমাকে একটি বিশেষ নৈতিক শিক্ষায় ঋদ্ধ করে। আর তা হল, আপনি যত আইনই প্রণয়ন করুন না কেন এবং যত পয়সাই খরচ করুন না কেন তা দিয়ে একজনের প্রতি অন্যজনের হৃদ্যতা-ভালবাসা কক্ষনোই সৃষ্টি করা যায় না।(পৃঃ ৯৪)

আমি এমন এক ব্যক্তির তালাশে ছিলাম যিনি হবেন স্নেহশীল, প্রীতিপূর্ণ, দরদী এবং হৃদয়বিশিষ্ট, রসিক মেজাজের ও তৎপর। একজন সজীব হৃদয়বিশিষ্টি ব্যক্তি যিনি আমার বাচ্চাদের নৈতিকতাকে সুষমামণ্ডিত করবে। কৌতুহলউদ্দীপক পর্যটনে ওদেরকে নিয়ে বের হবে। ওদের প্রতিটি ছোট-ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবে। ওদেরকে দোলিয়ে দোলিয়ে মিষ্টি ঘুম পারাবে। কিন্তু আস্তে আস্তে এবং বেদনাদায়কভাবে আমি এ তিক্ত সত্য পর্যন্ত পৌঁছুই যে, আমি যার তালাশে মাসের পর মাস কাটিয়েছি সেতো আমি ভিন্ন অন্য কেউ নয়। এটাই হচ্ছে সে কাজ যা আমার মতো একজন স্মার্ট মেয়ে ঘরে বসে করছে, AND THAT'S WHAT A SMART WOMAN LIKE ME IS DOING AT HOME (দ্রঃ READER'S DIGEST, AUGUST, 1988)

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে হলিউডের খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত চিত্রতারকাদের মধ্যে একজন ছিলেন মারলিন মোনরো। সুনামের মোহে মুহ্যমান এই তারকা অকস্মাৎ আত্মহত্যা করে নিজেকে নিজেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন। মারলিন মোনরোর আত্মহত্যার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ একটি চিঠির সন্ধান পায়। উঠতি বয়সের প্রতিটি কিশোরী, যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে খ্যাতির শীর্ষে উঠে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে চায় তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই ছিল মারলিনের বিয়োগান্দ হৃদয়ের এই চিঠি। মারলিন বলেছেন' এ-ধরনের খ্যাতির পেছনে কক্ষনো পড়ো না। জ্যোতির্ময় জগতের ধোঁকায় তোমাকে যেন কেউ না ফেলে। আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা, অশান্তির অতলান্তে নিমজ্জিত এক নারী। আমি মা হতে পারি নি ---। আমি ঘরোয়া জীবনকে ভালবাসি। একটি পবিত্র সুন্দর পারিবারিক জীবন। বরং এই

পারিবারিক জীবনটাকেই আমি নারী জতির সৌভাগ্য তথা সমগ্র মানবতার সৌভাগ্যের সনদ বলে মনে করি '(দ্রঃ মাসিক 'হাদারাতুল ইসলাম'দামেস্ক, পৃঃ৯৯, অক্টোবর'১৯৬২)

ধর্মীয় নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজের জন্য এ-বিধান দেয়া হয়েছিল যে পুরুষরা জীবিকার্জন করবে এবং মেয়েরা ঘরের দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। এভাবে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে সংগতিপূর্ণ জীবনযাপনে সামর্থ্য হবে। এটা ছিল একটা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাপনা। এটা কখনোই নারী পুরুষের সামাজিক ও মানবিক মান নির্ণয়ের জন্যে ছিল না। কিন্তু আধুনিককালে নারী স্বাধীনতার নামে যে বিপ্লব উঠেছে তা এ-ব্যবস্থাকে নারীজাতির জন্য মানহানিকর বলে চিহ্নিত করে স্লোগান তুলেছে যে, নর-নারীর কর্মক্ষেত্র অভিন্ন হওয়া চাই, এবং এ-ব্যাপারে ভাগ-বাটোয়ারার নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নির্ধারণ নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞারই নামান্তর। এ-স্লোগানটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে পুরো একটি নারীপ্রজন্ম ঘরের বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তথাকথিত সমান-অধিকারের আজ শত বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগৎ এ-অভজ্ঞতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ দেখেছে। কিন্তু এ-দীর্ঘ অভিজ্ঞতা উপরোক্ত স্লোগানের অন্ত ঃসারশূণ্যতা ও অপকারসর্বস্বতাকেই প্রমাণ করছে। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য জগতে এ উদাহরণ অহরহ পাওয়া যাচ্ছে ।

ধর্ম, নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এ-পার্থক্য রেখেছিল যে, পুরুষ জীবিকা অর্জন করবে। এবং নারী নয়া প্রজন্মের চারিত্রিক ভিত্তি গঠন করবে। MAN THE BREAD EARNER WOMAN THE CHARACTER BUILDER, আধুনিক সভ্যতা ধর্মের এ-নীতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছে, কিন্তু দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অবিসংবাদিতভাবে ধর্মীয় নীতিমালার সত্যতাই প্রমাণ করছে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারী

WAR'S UNWOMANLY FACE নামে নারী সম্প্রদায়কে নিয়ে মস্কো থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে IS, ALEXIYERICH - এর এ-বইটি ছাপিয়েছে মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৪১) বিস্ফোরণ ঘটার পর রাশিয়ান সরকার উদ্দীপনামূলক আপিল জানিয়ে জনগণকে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এতে উৎসাহিত হয়ে রাশিয়ান জোয়ানদের যে অংশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে, তন্মধ্যে আটলক্ষ ছিল ১৫-১৬ বছর বয়স্কা তরুণী। উপরোক্ত বইটি এ-তরুণীদের নিয়েই লেখা। লেখিকা দীর্ঘ চার বছর মেয়াদি এই গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালনার সময় একশত শহর পর্যটন করেছেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দুইশত নারীর সাক্ষাতকার নিয়েছেন ।

উক্ত গ্রন্থটি উল্লিখিত নারীদের ব্যাপারে তথ্যবহুল গবেষণায় সমৃদ্ধ, এবং এতে নানা রকম শিক্ষণীয় তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধোত্তরকালে অধিকাংশ মেয়েরাই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারটি ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাইছে। WE WANTED TO BECOME ORDINAR GIRLS AGAIN , MARRIAGEABLE GIRLE,) আমরা আবার সাধারণ তরুণীতে রূপান্তরিত হতে চাই, বিবাহ উপযুক্ত তরুণীতে।

VERA SAFRMOVNA DADOVA নাম্মী এক শিক্ষিতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীর সাথে লেখক সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন "যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া পুরুষের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পুরুষরা সাধারণত তুলনামূলকভাবে বাস্তববাদী এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারদর্শী। পক্ষান্তরে মেয়েরা ভাবে-অভিভূত হয়ে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয় প্রকাশ করে থাকে।

সাম্প্রতিককালে নারীপ্রকৃতি এবং নারীর সহজাত যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে বিস্তর গবেষণা চালান হয়েছে। নারী প্রকৃতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আবিষ্কার করার প্রয়াস চালান হয়েছে। এসব গবেষণা যেসব সত্য ও সিদ্ধান্তসমূহ উম্মোচিত করেছে তা থেকে বিস্ময়করভাবে প্রতীয়মান হয় যে নারী সম্পর্কিত ইসলামিক দৃষ্টিকোনই সঠিক।

অতি অগ্রসর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীপ্রকৃতি সহজাতভাবেই স্পর্শকাতর এবং পুরুষের তুলনায় সমধিক আবেগপ্রবণ (EMOTIONAL)। এসব গবেষণা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করছে যে, মহিলাদের এমনসব কাজে ও দায়ীত্বে অনুপ্রবেশ উচিত হবে না যেখানে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রভাবিত না হয়ে বাস্তবনির্ভর অভিমত পেশ করা দরকার পড়ে। যেখানে পৌরুষ এর প্রয়োজন মেয়েলিপনার নয়।

রাজনীতি, যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিচার বিভাগ, এবং শিল্প ক্ষেত্রের বড় বড় পরিকল্পনা বিভাগসহ এমনসব ক্ষেত্র যেখানে সুবিন্যস্ত চিন্তা ও আবেগপ্রবণতারহিত সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রয়োজন রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে নারী সম্প্রদায় তার সহজাত আবেগপ্রবণতার জন্যে স্বাভাবতঃ বেমানান। পক্ষান্তরে পুরুষ জাতি তুলনামূলক কম আবেগী হওয়ায় বাস্তবনির্ভর প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই ইসলাম দু'জনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত করে দিয়েছে। এটা কক্ষনোই নারী পুরুষের মানগত তফাত সৃষ্টির জন্যে নয়। এটা বরং ছিল শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ, যা নিতান্তই বিজ্ঞান সম্মত। আসলে নারী আন্দোলনের বার্তবাহকগণই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে ইসলামের পদ্ধতিই হল বাস্তবমূখী ও বিজ্ঞানময়।

সমাপ্ত